এই সময়

* কথাসরিৎ *

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যথাসময়ে

লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের সময় ভারতীয় জনতা পার্টি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিল ক্ষমতায় এলে দেশজুড়ে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সে উদ্যোগেরই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া বলেছেন ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও এই বিধি চালু করার কোনও প্রচেষ্টা না করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই কংগ্রেসের সমালোচনা করে আসছে। হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনগুলিকে সংস্কার করে যদি আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই বা তা সম্ভব হবে না কেন — প্রশ্নটি অসঙ্গত নয়। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ বা সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ব্যক্তিগত আইনগুলিকে ধর্মের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলে যে আধুনিক সমাজ গঠনের পথে অনেক সুবিধা হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে পারলে যে সমাজে মহিলাদের সমানাধিকারের পথ অনেকটাই সুগম হবে তা-ও অনস্বীকার্য। কাজেই এমন একটি বিধি চালু করার বিষয়ে আইন মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার কথা বলেছেন আপাত দৃষ্টিতে তাতে কোনও রাজনৈতিক দল, সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। বস্তুত বিতর্ক ও জনপরিসরে বৃহত্তর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ম নীতি নির্ধারণই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পথ। এর ফলে সকল পক্ষের বক্তব্যই আলোচিত হতে পারে এবং কেউই মনে করেন না যে তাঁর বা তাঁদের উপর কোনও আইন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বা সামাজিক আচারের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ নয়।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্যোগটিতে এ দৃষ্টিতে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা অন্যত্র। এই উদ্যোগ নিয়ে যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলি সব থেকে সোচ্চার সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই দেশে হিন্দুত্ববাদের প্রচারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ সাক্ষী মহারাজ সংসদেই স্বীকার করেছেন মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি 'রামের বংশোদ্ভুত নন' এমন সকলের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ অসংসদীয়। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বাজপায়ির বিশ্বাস তাজমহল এক প্রাচীন কোনও হিন্দু মন্দিরের অংশ। যে উদ্যোগের সঙ্গে এই সব ব্যক্তি ও তাঁদের সংগঠন যুক্ত তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিষয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের আস্থার অভাবকে খুব অস্বাভাবিক বলা যায় না। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দেশের পক্ষে মঙ্গলময় হতে পারে অবশ্যই, কিন্তু এ মুহূর্তে মোদী সরকারের সামনে অর্থনীতির হাল ফেরানো থেকে সীমান্তপারের ও অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী দমন পর্যন্ত আরও অনেক গুরুতর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেওয়ানি বিধি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতেই পারে, কিন্তু সব পক্ষের মত ছাড়াই দ্রুত তৎসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের চেষ্টার কোনওই প্রয়োজন নেই।

স্থূলত্ব

ইউরোপের একটি আদালত রায় দিয়েছে যে অসম্ভব স্থূলকায় মানুষদের এখন থেকে, তারা নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার বলেই, অন্য প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য সামাজিক সমস্ত রকমের সুবিধে দিতে হবে। এ কথা ঠিক, ইউরোপ এবং পশ্চিমের অন্যান্য ধনী দেশগুলোতে এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যের আবরণে জীবন জন্মমুহূর্ত থেকেই আচ্ছদিত থাকে বলে মোটাদের সংখ্যা বরাবরই একটু বেশি। গত কয়েক দশকে সে স্থূলকায় মানুষ শুধুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের প্রতীক মাত্র নন, এক ধরনের শারীরিক এবং সামাজিক অসুস্থতারও প্রতীক বটেন। প্রয়োজনের তুলনায় সব সময় অনেক বেশি খাদ্যবস্তু হাতের কাছে মজুত যে আছেই সর্বক্ষণ, সে তাদের চেহারা দেখলেই দিব্যি টের পাওয়া যায়। অতএব, তাদের প্রয়োজন এখন হুইলচেয়ার, তাদের ঢোকা বেরনোর জন্য দরজা কাটিয়ে প্রস্থে বাড়াতে হয়, সিঁড়ির বদলে গড়ানো ঢাল তৈরি করতে হয় অট্টালিকার ছাদ অবধি তাদের গমনাগমন মসৃণ করার জন্যে। যারা পাতলা শরীর নিয়ে হাওয়ায় ভর দিয়ে দৌড়তে পারেন না, যাদের কথায় কথায় হাঁপ ধরে, যাদের হৃদরোগ এখন যাই তখন যাই অবস্থা সব সময়, যাদের মানসিক স্থৈর্য দিন রাতের সব সময়ই খাদ্য-চিন্তায় টলোমলো, তাদের প্রতিবন্ধী বলতে বাধা নেই পুরনো নিয়ম মতে। তবে এখন যেহেতু সেই শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না, তাই স্থূলকায় ব্যক্তিদের জন্যও নতুন শব্দ আমদানি করা হবে নিশ্চই। মুশকিল হল, স্থূল শরীর আর একটি বিশেষণের ভার কদ্দুর বহন করতে পারবে সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এবং সন্দেহের কারণগুলি অবাস্তব আজগুবিও নয় খুব একটা। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পশ্চিমি দুনিয়ায় এক একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে নানাবিধ নতুন শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও মাথার ব্যামোর প্রকোপ বেশ বেড়েছে। তা সে এতটাই যে অনেকেরই মতে

মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর বিষয় নিয়ে কেবল একে অপরকে দোষারোপ করে ক্ষুদ্র রাজনীতি করা ঠিক নয়। লিখছেন

মইদুল ইসলাম

কৌশিক রায়

কৌশিক রায়

উন্নয়ন, অধিকার আর জীবিকার পরিবর্তে এখন তর্ক হবে অনুপ্রবেশ নিয়ে?

২০১৪ সালের বড় চমক ছিল নির্বাচনী রাজনীতির বাইরে থেকে আশা একঝাঁক তারকার লোকসভা নির্বাচনে লড়া। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল ও বিজেপি প্রায় কুস্তি করেছে কে কত বড়ো তারকাখচিত প্রার্থী তালিকা তৈরি করার জন্য। তারকামণ্ডলিত প্রার্থী তালিকা অনেক যোগ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উপেক্ষা করল যারা বেশ কয়েক বছর ধরে তৃণমূল বা বিজেপি-র ঝাণ্ডা হাতে মাটি কামড়ে রাজনীতি করে। তারা তারকাদের মতো শীতের পরিযায়ী পাখি হয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। তৃণমূল ও বিজেপি-র উচ্চতর নেতৃত্বের অনেকেই তো দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই করেছেন। নির্বাচনী রাজনীতিতে কিছু আনকোরা মানুষকে প্রার্থী করে নিজেদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি অবিচার করতে মোটেও বুক কাঁপল না? তা কে শোনে কার কথা? তারকাদের দাপাদাপিতে আজকাল ঝাণ্ডা ধরা রাজনৈতিক কর্মীরা আদার ব্যাপারির সমান। ভোটে জিতে জাহাজ চড়ার মনোকামনা পূর্ণ হওয়া মুশকিল। তা হতে পারত যদি তিনি উচ্চতর নেতৃত্বের কোনও ভাই, ভাইপো, বোন বা সন্তান হতেন। তাই বঙ্গ রাজনীতিতে 'বংশ' এখন দু'ভাবে উঠে এসেছে। এক, পরিবারতন্ত্রের হাত ধরে। আর দুই, 'বংশ' বলে এক তৎসম শব্দ যা চলতি ভাষায় এক বিশেষ প্রকারের গাছের নাম, কিন্তু যা অনেক সময় গালাগাল করা 'ভাষা সন্ত্রাস'-এর সমান। গণতন্ত্রের মধ্যে 'বংশ' রাজনীতি করলে এক দিকে যেমন পরিবারতন্ত্রের হাত ধরে আসলে রাজতন্ত্র কায়েম হয়, অন্য দিকে 'বংশ' দেওয়ার নামে লুম্পেন রাজনীতি সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেয়। এই লুম্পেন রাজনীতি কিছু তোলাবাজ ও চিটিংবাজদের নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং টাকা লুট করে। অথচ বাংলার মানুষ তো এই রাজনীতি দেখার জন্য ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেয়নি।

২০১১ সালে বামফ্রন্ট দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হয়। ২০১১ সালেই শেষ আদমসুমারি হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবহার, পরিস্রুত পানীয় জল, ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা এবং টেলিভশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের 'সোনার বাংলা' জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ পিছনে। তাই মানুষ জানতে চায় যে গত সাড়ে তিন বছরে এই সব ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি হল। আমাদের রাজ্যে আজ রুটি-রুজি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাটের মতো মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা হচ্ছে না। একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। দক্ষ শ্রমিকের পুজো বিশ্বকর্মা আর তেমন হচ্ছে না। কয়েকটা হলেও, আগের জৌলুস নেই। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে কলকাতার আকাশ মাত্র দু'দশক আগে পর্যন্ত ঘুড়িতে ছেয়ে যেত। কিন্তু চিন্তা নেই। বাঙালি এখন অবাঙালি তেজারতির গণেশ পুজো করছে। ফলমূল প্রসাদ ছেড়ে হলদিরামের লাড্ডু বিতরণ করছে। উৎপাদন বন্ধ। তাতে কী? ছুটি তো বাড়ল। একের পর এক পুজো-পার্বণ-ঈদের ছুটি। বাঙালি এমন ছুটিতে মজল যে 'পুচকে ছানার উত্তেজনা' মিশ্রিত বিদ্রোহী স্পৃহার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ 'হোক কলরব', একটা বড়ো মিছিল/জমায়েত (মবিলাইজেশন) থেকে আর আন্দোলনে (মুভমেন্টে) পরিণত হল না।

অন্য দিকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা আবার মানুষের কানে কুমন্ত্রণা দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছে। ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রেণি ও ভাষার মতো আরও কিছু মৌলিক বিষয়। মানুষ ধনী, মধ্যবিত্ত না গরিব অথবা পুঁজিপতি, কৃষক না শ্রমিক পরিবারে জন্মেছে— কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট পরিবারে জন্মাবার কারণেই কিছু অধিকার সে জন্মসূত্রে পায় বা বঞ্চিত হয়। আবার জন্মাবার পরে ভাষা না শিখলে তো সে ধর্মের কথা ভাবতে পারবে না। 'গড', 'ঈশ্বর', 'ভগবান', 'খুদা', 'আল্লাহ' বলতে গেলে সে তার মাতৃভাষায় আগে বলতে শেখে। অর্থাৎ শ্রেণি ও ভাষা, ধর্মের ভাবনার থেকে অনেক বেশি মৌলিক। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের পরিচিতিকে শান দিয়ে বাকি পরিচয়গুলোকে অনেক সময় ভুলিয়ে দিতে চায়। দুই বাংলার ইতিহাস সাক্ষী যে এহেন ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক সময় শ্রেণি ও ভাষাগত রাজনীতি টক্কর দিতে পারে।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের দেওয়াল ভেঙে সম্প্রীতির মজবুত ভিত গড়ার জন্য সিমেন্ট কোম্পানি পর্যন্ত বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বামেরা তো আর কোম্পানির মতো ধর্মীয় সম্প্রীতিকে পণ্য হিসেবে বাজারি বিজ্ঞাপন দেন না। আবার অতীতে তৃণমূলের মতো বিজেপি-র সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করেনি। বাংলার এক জনপ্রিয় বাম মুখ্যমন্ত্রী এক সময় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কারবারীদের 'অসভ্য' ও 'বর্বর' বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হননি। ওই উক্তি করে উনি এক বিজেপি নেতার সঙ্গে আশির দশকে, কলকাতার ময়দানে হাত ধরে সভা করার পুরনো ভুল অনেকটা শুধরে নিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছিলেন যে যারা বাবরি মসজিদের মতো ধর্মস্থান ধ্বংস করে এবং মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের হত্যা করে, তাদেরকে 'অসভ্য' ও 'বর্বর' বলা ছাড়া অভিধানে অন্য কোনও শব্দ খুঁজে পাননি। এহেন বাম নেতার উত্তরসূরিদের কাছে তো আরও চরম বিজেপি বিরোধিতা আশা করছেন মানুষ। কলকাতায় বামেদের মিছিলে নাকি লোক হচ্ছে। তা ভালো কথা। কিন্তু কেবলমাত্র কলকাতায় মিছিল করলে তো চলবে না। গ্রামেগঞ্জে যে মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং অনেকেই যারা অনন্যোপায় হয়েই বামেদের ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন তাদের পাশে তো বাম নেতৃত্বকেই দাঁড়াতে হবে। সেই সব প্রান্তিক মানুষকে ভরসা যোগাতে হবে। সর্বোপরি বাম শাসনকালের কিছু ভুল নীতি, মানুষের উপর কিছু অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচারের জন্য বাম নেতৃত্ব থেকে বাম কর্মী, সবাই যদি মাথা নিচু করে মানুষের দরবারে গিয়ে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা না চান, তা হলে মানুষ বামেদের উপর আর কেন ভরসা করবেন?

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বামেরা নিজেদের ২০ শতাংশ ভোট হারিয়েছে। অন্য দিকে কেরল বা ত্রিপুরায় কিন্তু বামেদের এত খারাপ হাল হয়নি এবং ওই রাজ্যগুলোতে বামেরা তাদের রাজনৈতিক সমর্থন মোটামুটি অটুট রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ ২০০৮ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার এবং ২০০৯ ও ২০১১ সালে কংগ্রেস আর তৃণমূলের জোট হওয়ার সঙ্গে এ রাজ্যে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ফলাফল খুব একটা নির্ভর করেনি। অতীতে ২০০১ সালে কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোট হওয়া সত্ত্বেও বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়েছিল। এ রাজ্যে বামেদের ভোট কমেছে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন কিছু ভুল ভ্রান্তির জন্য এবং বিশেষ করে, ২০০৬ সাল থেকে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। এই বাস্তব সত্যটা বাম নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করবেন ততই তারা নতুন রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে আগামী নির্বাচনগুলোতে ঝাঁপাতে পারবেন। ব্রিগেডে এবং মিছিলে তো পার্টির কর্মী ও কট্টর সমর্থকরাই যোগ দেয়। কিন্তু ছাপোষা মানুষ যারা প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে আর নির্বাচনের দিন চুপচাপ ভোট দিতে যায়, তারা কী ভাবছে সেটা বুঝতে গেলে তো বামেদের নতুন করে মানুষের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মানুষের সঙ্গে সেই সম্পর্ক কিন্তু স্থানীয় স্তরে এলাকার দাগি ও অসৎ বলে পরিচিত নেতাদের দিয়ে হবে না। পার্টিকে সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত করে, পার্টির শুদ্ধিকরণ করেই মানুষের আস্থা আবার ফিরতে পারে।

শুভজ্যোতি কাঞ্জিলাল

ব্রিগেডে এবং মিছিলে তো পার্টির কর্মী ও কট্টর সমর্থকরাই যোগ দেয়। কিন্তু ছাপোষা মানুষ যারা প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে আর নির্বাচনের দিন চুপচাপ ভোট দিতে যায়, তারা কী ভাবছে সেটা বুঝতে গেলে বামেদের নতুন করে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

অন্য দিকে বামেদের এটাও বুঝতে হবে যে নেতৃত্বের পুরনো মুখগুলো সংগঠনের একটা অংশ দেখতে চাইলেও, সাধারণ মানুষ সেই পুরনো নেতৃত্বের বদল চাইছেন। এই বিষয়ে এ রাজ্যে বামেরা বরং কংগ্রেসের অতীত ইতিহাস থেকে শিখতে পারে। ১৯৭২-৭৭ এর সময়কালকে বামেরা অত্যন্ত অগৌরবের ইতিহাস বলে বরাবর প্রচার করেছেন। পরবর্তীকালে যখনই কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গের শেষ কংগ্রেস মুখমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তখনই বামেরা ১৯৭২-৭৭ ফিরে আসছে বলে গেল গেল রব তুলতেন। তাই বামেরা যদি আবার এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে অথবা একটু পিছনে রেখে নির্বাচনী রণকৌশল সাজায় তা হলে খুব বিশেষ যে কাজ হবে তা মোটেই বলা যাচ্ছে না। উল্টে বিরোধীরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ঘটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই-রিজওয়ানুর-রেশন মারপিট কাণ্ডের মতো মাত্র কয়েক বছর আগের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দেবে। এই রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের শেষ মুখ্যমন্ত্রী ও বামফ্রন্ট সরকারের শেষ মুখ্যমন্ত্রী, দু'জনেই নিপাট ভদ্রলোক। তাঁরা হয়তো তাঁদের মতো করে বাংলার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল যে মানুষ তাঁদের নেতৃত্বকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই বাস্তব সত্য বামেরা যত তাড়াতাড়ি বুঝে, নেতৃত্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারবেন তত তাদের মঙ্গল। আশা করি পক্বকেশ বাম নেতৃত্ব এটা বোঝেন যে সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না, আর এখানে বিজেপি, 'বিকল্প' বিরোধী শক্তি হিসেবে বামেদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে।

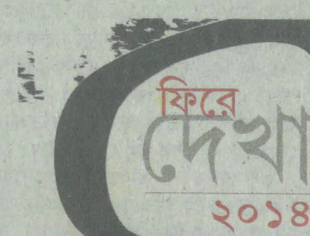

কিন্তু আজ বাংলায় বিজেপি-র বাড়বাড়ন্ত কেন লক্ষ করা যাচ্ছে? ভবিষ্যতে এই রাজ্যে বিজেপি উত্থানের কি কোনও সামাজিক ভিত্তি আছে? বেশ কয়েক বছর ধরে লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর বাংলায় মছলিবাবা অথবা বিরিঞ্চিবাবার থেকে একটু কম প্রতিভাসম্পন্ন কিছু ভণ্ড লোক, সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের রমরমা ব্যবসা করছে। অন্য দিকে বিজ্ঞান ও যুক্তি চর্চার মঞ্চগুলো আজ জনসমক্ষে খুব একটা দেখা যায় না। কলকাতা শহরের মধ্যে সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেক দিন ধরে যে 'ghetto' তৈরি হয়েছে সেগুলোকে যেন আরও বেশি করে লালন পালন করা হচ্ছে বিশ্বায়নের জমানায় 'গেটেড কমিউনিটি'র মাধ্যমে। খিদিরপুর-একবালপুর-মমিনপুর-মেটিয়াবুরুজ-এর মানুষ তাঁদের এলাকায় বাজারহাট করেন। আবার গড়িয়াহাট-যাদবপুর-বেহালা-ভবানীপুর এর বহু বাসিন্দা একবালপুর-মমিনপুরের অলিগলি চেনেন না বললেই চলে। তেমনই পার্কসার্কাস-তোপসিয়ার আর ক'জন বাসিন্দা শ্যামবাজার-বাগবাজারের রকে বসে (আহা থুড়ি, রক তো আর বিশেষ নেই) বা নিদেনপক্ষে সিঁথির চা দোকানে আড্ডা মেরেছেন? পশ্চিমবঙ্গের শহর ও মফস্সল থেকে প্রত্যেক বছর গ্রীষ্ম অথবা পুজোর ছুটিতে মানুষ ভিন রাজ্যের সিমলা, পুরী, গোয়া, আগ্রা, উটি ইত্যাদি জায়গায় বেড়াতে যান। এই লেখকের এক অধ্যাপক বন্ধু, সম্প্রতি এক খবরের কাগজে লিখেছেন যে এক বছর একটু প্রতিবেশী ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ঘুরে আসার কথা কি ভাবতে পারি না? হক কথা। হোক কথা। দুই বাংলার মধ্যে। অযৌক্তিক বাংলা ভাগ যা ঋত্বিক ঘটক, বা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সাদাত হাসান মান্টো, মন থেকে কখনও মেনে নিতে পারেননি, সেই আজকের বিদেশ, কিন্তু কয়েক দশক আগে পর্যন্ত যে একই দেশ ছিল, সেই সব জায়গায় মানুষ কেমন আছেন, তা কি দেখতে পারি না? এখন তো বাংলাদেশে যাওয়ার ভিসা/ছাড়পত্র ও যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে গেছে। আসলে এই ধরনের যাওয়া-আসা, ভ্রমণ বিলাসের মাধ্যমেই তো এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে চিনতে শিখবে। একে অপরকে আরও বেশি জানতে ও বিশ্বাস করতে শিখবে।

এগুলো যখন হয় না তখন বাঙালিকে হিন্দু-মুসলমানের নামে ভাগ করার অপচেষ্টায় উদ্যত হয় কিছু দিল্লি-গুজরাটের নেতারা। আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দলে ভিড়ে যায় কিছু বঙ্গজ সন্তান। এহেন কুকাজ স্বাধীনতার আগেও হয়েছে। আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাই 'উন্নয়ন', 'অধিকার' এবং 'জীবিকার' মতো চেনা রাজনীতির রাজপথ ছেড়ে অচেনা অলি গলি ধরে (মুসলিম) 'অনুপ্রবেশ' আর (হিন্দু) 'শরণার্থী' নামক, আগে পাত্তা না পাওয়া কিছু রাজনৈতিক শব্দবন্ধ আবার উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। ভাবটা এমন, 'অভিবাসন' (immigration) বলে যে একটা আইনি শব্দবন্ধ আছে তা যেন বিশেষ একটা উচ্চারিত না হয়। কারণ, তা হলে সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে যে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় যারা আসেন, তাদের বৈধ 'অভিবাসন' দেওয়ার মূল দায়িত্ব কার? প্রশ্ন উঠতে পারে যে রুটি-রুজি, কর্মক্ষেত্র, আত্মীয়তার সূত্রে অথবা এক দু'জন যদি কোনও অবৈধ কার্যকলাপের অভিসন্ধি নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসে, তাদের বৈধ অভিবাসনের ব্যবস্থা করা ও দেশীয় সীমানা পারাপারের দেখভাল করা, কাদের দায়িত্ব? যথারীতি দিল্লির মন্ত্রী-সান্ত্রিরা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা অফিসাররা এ ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব একদম ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। সীমান্ত এলাকায় ঘুষ ও উপঢৌকন-এর বিনিময়ে কী ভাবে বেআইনি পারাপার হয়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও কাস্টমস অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে অথবা পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে চোরাকারবারি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর যে অপচেষ্টা হয়, সেই নিয়েও আজকাল গবেষণা হচ্ছে। এইসব কথা না বলে, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর বিষয় নিয়ে কেবল একে অপরকে দোষারোপ করে ক্ষুদ্র রাজনীতি করা ঠিক নয়।

আগামী দিনগুলোতে বঙ্গ রাজনীতির দাদা, দিদি ও জ্যাঠামশাইরা এক ক্ষুদ্র মাস্টারমশাইয়ের কথা না শুনতে পারেন। চন্দ্রবিন্দুর বুলি 'ছোটো আছো ছোটো থাকো, সস্তা সাবান মাখো' বা 'ধ্যাত্তেরিকা' বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতির ময়দানে জনতাকে কী করে উপেক্ষা করবেন?

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক